126

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 APR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সার্টিফিকেট জালিয়াতি

মাছের মাথায় পচন ধরলে তা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বেই। ভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠ। পচনটা যখন সেখানে ধরে, তখন তা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে ফেলতে বাধ্য। এ রকম দুর্ভাগ্যজনক বা চরম উদ্বেগজনক একটা অবস্থার খবর পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম থেকে। চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে এ পর্যন্ত ২০৭টি জাল সার্টিফিকেট উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর এক খবর এসেছে। শিক্ষাঙ্গনে এ রকম ঘটনা শুধু নজিরবিহীন নয়, অভাবিতও। এর আগে কখনও-সখনও কোন একটি বোর্ডের বা কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেটধারীর অকস্মাত ধরা পড়ে যাওয়ার বিক্ষিপ্ত দু'একটি সংবাদ যে বেরোয়নি তা নয়। কিন্তু তা ছিল মাত্র বিক্ষিপ্ত দু'একটি ঘটনাই। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। মানুষ তা নিয়ে তেমন ভাবনাতেও পড়েনি। বিভিন্ন সময় পরীক্ষার ফল নিয়ে ঘাপলা বা কম্পিউটার কিডাটের ঘটনা অবশ্য ঘটেছে এবং তার জন্য পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি ও দুর্ভোগও হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার অধঃপতন বা পচন যে ভিতরে ভিতরে কতদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে, চট্টগ্রামের ঐ ঘটনা উদ্ঘাটিত হওয়ার আগে কারও বোধহয় সে সম্পর্কে তা ধারণাতেও আসেনি। এ অধঃপতন বা পচন যে এখনই সর্বব্যাপী রূপ নিয়ে ফেলেছে, তা হয়ত নয়। হয়ত এখনও তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তবে ঘটনাটা এমনই হতচকিত বা বিস্ময়বিমূঢ় করে ফেলার মতো যে, এরকম ঘটনার গতি দ্রুততার সঙ্গে ঐখানেই স্তব্ধ করে দিতে না পারলে তার যে বিস্তার লাভ করার সমূহ আশঙ্কা থাকে সেটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এমনিতেই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অজস্র সমস্যায় জর্জরিত। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এমন জাল সার্টিফিকেট দেয়ার চক্র গড়ে উঠতে থাকলে গোটা জাতির চরম সর্বনাশ ঘটতে বেশি সময় লাগবে না।

জনকণ্ঠের চট্টগ্রাম অফিস থেকে পাঠানো এবং গত মঙ্গলবার প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরটিতে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে আছে ১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের একটি জালিয়াত চক্র অত্যন্ত সুকৌশলে প্রায় এক যুগ ধরে বিভিন্ন পরীক্ষার জাল সার্টিফিকেট দিয়ে আসছে; ইস্যু হয়ে গেছে বিভিন্ন সময় সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; ২. এ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ঐ সার্টিফিকেটগুলো জাল বলে ধরা পড়েছে চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর শক্তিশালী একটি টিমের অব্যাহত তদন্তের ফলে; গত প্রায় ৪ মাস ধরে সরকারী অনুমোদন নিয়ে ঐ টিম এই তদন্ত চালাচ্ছে; ৩. টিমের তদন্ত শেষ হলে জাল সার্টিফিকেটের সংখ্যা কী পরিমাণে গিয়ে ঠেকবে তা বলা মুশকিল।

এটা না বোঝার কিছু নেই যে, জালিয়াত চক্রটির পুরো নেটওয়ার্ক উদ্ঘাটন করে রাঘব-বোয়াল থেকে চুনোপুটি পর্যন্ত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব দুর্বৃত্তকে আটক করা ও চিরতরে ঐ চক্রটিকে নির্মূল করে ফেলার জন্য উল্লিখিত তথ্যগুলো হয়ত আদৌ যথেষ্ট নয়। তবে, সচেতন এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী মানুষ মাত্রই চাইবেন, একবার উদ্ঘাটিত যখন হয়েছে, জালিয়াত চক্রটিকে যে কোনভাবেই হোক একেবারে নির্মূল করতেই হবে। এ চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেই হবে, ভবিষ্যতে এ ধরনের জালিয়াতির পথ গ্রহণের কোন রকম সাহসই যাতে আর কারও না হয়, সেজন্য।

এ জালিয়াত চক্রের দুষ্কর্মের বিষময় ফল এই দীর্ঘ সময়ে বিস্তৃত হয়ে গেছে সমাজদেহের অনেক গভীরে। সার্টিফিকেট জালের কাজটি শুরু হয়েছে নাকি আশির দশকে। ধরা পড়া ২০৭টি জাল সার্টিফিকেটের মধ্যে ৫৯টি হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কলেজের এবং গত ৩ বছরের শিক্ষাবর্ষের বিএ, বিকম, বিএসসি, বিএসএস, এলএলবি ও অনার্স সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের। একটা সার্টিফিকেটের যা যা সুবিধা, তা সে সব সার্টিফিকেটধারী যথারীতি ইতোমধ্যে ভোগও করে চলেছে। অর্থাৎ সেগুলোর বদৌলতে পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ ও কৃতকার্য হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবনে প্রবেশের সুবিধা তারা ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্নটা ব্যক্তি বিশেষের লাভালাভ নিয়ে নয়, প্রশ্নটি হচ্ছে, প্রথমত এর ফলে একটি ভয়াবহ অসাধু ব্যবস্থা শিক্ষা বিভাগের মধ্যে বিষাক্ত ছত্রাকের মতো বাসা বেঁধে থাকছে ও পরীক্ষা পদ্ধতিসহ তাবত শিক্ষা পদ্ধতিকেই তা করে ফেলছে সম্পূর্ণ অর্থহীন; দ্বিতীয়ত জাল সার্টিফিকেটের বদৌলতে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মজীবনে প্রবেশ কার্যত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ক্রমাগত বিপজ্জনক, ক্ষতিকর কিংবা বন্ধ্যা করে তোলার পথেই ঠেলে দিচ্ছে। এই সামগ্রিক অবস্থাই অত্যন্ত অবাঞ্ছিত, দেশ ও সমাজের জন্য নিদারুণ কলঙ্কজনক ও গ্লানিকরও বটে।

'৯৩ সালে প্রাথমিকভাবে যখন সার্টিফিকেট জালিয়াতির কয়েকটি ঘটনা ধরা পড়ে তখনও এর শিকড় যে কত গভীরে চলে গেছে তা ধারণাও করা যায়নি। '৯৪ সালে সিন্ডিকেটের সভায় এ ব্যাপারে গঠিত ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে যখন বলা হয়, ১২৪ জন পরীক্ষার্থীকে অবৈধভাবে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন সেসব ফলাফলের অন্তর্নিহিত রহস্য ক্রমশ উদ্ঘাটিত হতে থাকে। দেখা যায়, গলদটা একেবারে সর্ষের মধ্যেই ভূতের আছরের মতো খোদ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মধ্যেই। সে বিভাগের বেশিরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবৈধ আয়ের একটি উৎসই হয়ে দাঁড়িয়েছে ফলাফল নিয়ে নানান অনিয়ম ও জালিয়াতি করা। পাসের মোট সংখ্যা ঠিক রাখতে গিয়ে ঐ জালিয়াত চক্র পাস করা অনেক ছাত্রকে ফেল দেখিয়ে ফেল করাদের পাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। পাস-ফেল, বিভাগ পাওয়া, জাল নম্বর পাওয়া, সবকিছু নিয়েই ঐ চক্র একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় সব অপকীর্তি করে এসেছে। ইতোমধ্যে '৯৪-এ দু'দফায় প্রদত্ত তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশে সিন্ডিকেট সভায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ চারজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হয়েছে। তারপরেও পুরো ঘটনা ও ঘটনার কুশীলবদের সম্ভবত বেশিরভাগই অনুদ্ঘাটিত থেকে যাওয়ায় ঢাকার দুর্নীতি দমন বিভাগের মহাপরিচালকের মঞ্জুরি নিয়ে '৯৫-এর ১২ নবেম্বর থেকে চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন অফিসারের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি টিম এখনও এ বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লিখিত ২০৭টি জাল সার্টিফিকেট উদ্ঘাটন ঐ তদন্তের ফল। আমরা বলব, এ রকম কেলেঙ্কারি যাতে কালক্ষেপণের ফলে কোনভাবেই ধামাচাপা না পড়ে যায়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশে সবক্ষেত্রেই প্রশাসনের বড় দুর্বলতাই হচ্ছে জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মধ্যে এ রকম জালিয়াত চক্র গড়ে উঠতে পারত না। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে সবক্ষেত্রেই। প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে সর্বত্রই চালু করতে হবে ত্রুটিমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অকার্যকর ও অর্থহীন করে ফেলা হলে জাতি কখনই নিজের পায়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। জাতির জন্য তা হবে বড়ই নিন্দা ও অগৌরবের বিষয়। দেশের স্বাধীনতাই হয়ে পড়বে অর্থহীন। সেটা কারোই কাম্য হতে পারে না।